নারী শিক্ষা প্রসারে সরকারি পদক্ষেপ

অষ্টাদশ শতকের সামাজিক রাজনৈতিক সমস্যার সামনে ভারতবর্ষ তথা বাংলার দেশীয় শিক্ষাব্যবস্থা তার নিজের রুপটি অক্ষুন্ন রাখতে পারেনি। পুরাতন দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় অন্তঃপুরে শিক্ষার স্থান কি রকম ছিল, এবং মহিলারা প্রকাশ্যভাবে কতটা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারতেন, এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে জানা যায় খুব সীমিত ক্ষেত্রে সম্পত্তির অধিকার, নিজেদের শরীর ও মনের উপর অধিকার, ও অধিকাংশ মৌলিক অধিকার নারী র ছিল।ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে অর্থনৈতিক শ্রেণী বৈষম্য ছাড়াও পুরুষ ও নারীর মধ্যে শ্রেণিবৈষম্য সমাজের বিভিন্ন স্তরে সমান্তরালভাবে অবস্থান করতো।

উপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থাতেও ইংরেজ সরকার কোনরকম ভাবেই নারীর শ্রেণীবৈষম্য মেটাবার ব্যবস্থা করেননি। যেটুকু সামাজিক সংস্কার তারা করেছিলেন তার পেছনে মূল লক্ষ্য ছিল শাসন ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় ভিত্তিতে কায়েম করা এবং ভারতীয় সমর্থক সংগ্রহ করা।ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিস্তারের ফলে শাসকবর্গের আরো বৃহৎ ব্যাপক জনসমর্থন এর প্রয়োজন হয় এবং সে কারণে তারা দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন করার কথা ভাবে এবং যার জন্য নারীকেন্দ্রিক চিন্তা ভাবনা গুলো তাদের মধ্যে যুক্ত হয়।

দেশের জনগণের শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে বার্ষিক এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ করে এই টাকা কাদের জন্য খরচ করা হবে এই প্রশ্নের উত্তরে ব্রিটিশ সরকার স্ত্রী অথবা পুরুষের সমতা কথা বিবেচনা করেন নি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কোম্পানি পরিচালিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলি ছিল **কলকাতা মাদ্রাসা সংস্কৃত কলেজ**, এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে স্ত্রীশিক্ষার কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।১৮১৫সালে লর্ড হেস্টিংস ভারতীয় শিক্ষা ব্যবস্থার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেন কিন্তু প্রাক কোম্পানির যুগের দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার কোনো উন্নতি সাধন করার কথা ব্রিটিশ শাসকদের মুখে শোনা যায়নি।

রেভারেন্ড **অ্যাডামের** বিখ্যাত **রিপোর্টে(১৮৩৫-৩৮)** ভারতে দেশীয় শিক্ষা ব্যবস্থার এক করুণ চালচিত্র খুঁজে পাওয়া যায়।রাজশাহী জেলার বিবরণ দেওয়ার সময় স্ত্রীশিক্ষার অশিক্ষার এক

ভয়াবহ চিত্র এখানে উপস্থিত করা হয়েছিল।রানী ভবানীর মত বিচক্ষণ মহিলার নেতৃত্বে অঞ্চলটি দায়িত্বে থাকা সত্ত্বেও তার থেকে ১৪ বছর বয়সে সমস্ত মেয়েরা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হতো এমনকি তাদের শিক্ষা দেবার কথা তাদের অভিভাবকেরা বিচার বিবেচনা করতেন না। মূলত ধর্মীয় কুসংস্কার বসত এই ধরনের আচরণ করা হতো বলে মনে করা হয়েছে।শিক্ষা নারীর জীবনে বৈধব্যের অভিশাপ ডেকে আনবে এই ধারণার বশবর্তী হয়ে মেয়েদের শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হতো।

১৮৩৪ সালে **মেকলের** ভারতে আগমন এবং আইনসভার সদস্য পদে যোগদানের ঘটনাকে ভারতবর্ষে শিক্ষার ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ মনে করা হয়।ম্যাকলের উপর গভীর আস্থা থাকার কারণে বড়লাট বেন্টিঙ্ক তাকে জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক ইন্সট্রাকশন এর প্রেসিডেন্ট পদে নিযুক্ত করেন।মেকলে বিখ্যাত প্রস্তাব (**মেকলে মিনিট ১৮৩৫**)ভারতবর্ষের ভবিষ্যতে শিক্ষা কিরূপ হবে সে সম্পর্কে সমস্ত দ্বন্দ্বের অবসান ঘটায়।এক্ষেত্রে আশ্চর্যের ঘটনা এটাই যে অ্যাডামের রিপোর্ট থাকা সত্ত্বেও মেকলের প্রস্তাবে স্ত্রী শিক্ষা সম্পর্কিত সামান্যতম বিবৃতিও দেওয়া হয়নি। ভারতবর্ষের 'আদিম সমাজ'কে উন্নতি লাভ করানোয় ছিল মূলত মেকলের উদ্দেশ্য।কিন্তু তথাকথিত আদিম সমাজের তলার দিকে যাদের অবস্থান তাদের কিভাবে তুলে আনা হবে সেই সম্পর্কে মেকলে আশ্চর্যজনকভাবে নীরব ছিলেন।শাসক হিসেবে স্ত্রী শিক্ষার প্রতি কোম্পানির নিলিপ্ত নির্বিকার মনোভাবকে এক প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিরোধের পর্যায়ভুক্ত করা যায়।এমনকি ভারতীয় বিদ্বজনের তরফ থেকে সরকারের কাছে মহিলা বিদ্যালয় খোলা প্রস্তাব পেশ করা হলেও, সরকার বাহাদুর আর্থিক সঙ্কটের যুক্তিতে সেই প্রস্তাব নাকচ করেন।

পরবর্তীকালে বেথুন দেশীয় মহিলাদের উন্নতিকল্পে যে বিদ্যালয় স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন সেটি সম্পূর্ণ তিনি সরকারি সাহায্য ব্যতিরেকে গড়ে তোলেন। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে বেথুন কিন্তু উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী ছিলেন তা সত্ত্বেও তিনি কিন্তু সরকারি সাহায্য পাননি।১৮৪৯ খ্রিস্টাব্দে মাত্র ২১ জন ছাত্রী নিয়ে প্রতিষ্ঠিত কলকাতা মহিলা বিদ্যালয় তার যাত্রা শুরু করে। ঠিক এরপরেই দেশীয় উদ্যোগেও বড় বড় জমিদাররা বিভিন্নস্থানে বালিকা বিদ্যালয় খোলার উদ্যোগ নেন।কিন্তু এইসব বিদ্যালয়ের কমিটি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি কারণ স্থানীয় জনগণের বিরোধিতা এবং সরকারি নিষ্ক্রিয়তা।লর্ড ডালহৌসির কাছে লেখা একটি বিখ্যাত চিঠিতে বেথুন এইসব বিদ্যালয় প্রতি প্রাদেশিক সরকার যেন মনোযোগ দেন এই মর্মে একটি অনুরোধ জারি করেন।

১৮৫০সালের ১২ ই আগস্ট বেথুনের অকালপ্রয়াণ এর পর ডালহৌসির উদ্যোগে ডিরেক্টরস বিদ্যালয়টিকে গ্রহণ করে এবং বেথুন নামাঙ্কিত এ বিদ্যালয়টি সরকারি পরিচালিত প্রথম মহিলা শিক্ষায়তন রূপে গণ্য হয়।

কিন্তু এই সময়কালে দেখা যায় পুরুষদের শিক্ষা বিপুল পরিমাণ অগ্রগতি লাভ করেছিল।**হিন্দু কলেজ মেডিকেল কলেজ এশিয়াটিক সোসাইটির** মধ্যে দিয়ে বিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান চর্চার সূত্রপাত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে পুরুষরা বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যা জগতে প্রবেশ করতে পেরেছিল, কিন্তু সেখানেই মেয়েদের অতিসাধারণ প্রাথমিক শিক্ষা ধারণার মধ্যেই কুক্ষিগত করে রাখা হয়।

স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে ভারতীয় স্ত্রী ও পুরুষদের প্রতি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এই বৈষম্যমূলক নীতি কে কিভাবে ব্যাখ্যা করা সম্ভব? শুধুমাত্র দেশে সমাজব্যবস্থার প্রতি হস্তক্ষেপ না করার নীতি? ব্রিটিশ সরকারের ভিক্টোরিয়ান আদর্শের প্রতি অনুগত থাকার জন্য তারা ভারতবর্ষের ক্ষেত্র এর নীতি প্রয়োগ করছেন?

এই প্রশ্ন গুলি বিচার বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের ভবিষ্যৎ কি হবে সেই সম্পর্কে তখনও পর্যন্ত সরকার সুনিশ্চিত ছিলেন না।স্ত্রী সমাজকে শুধুমাত্র আদর্শগত কারণে শিক্ষার আলোকে নিয়ে এলে দেশে জনগণের মধ্যে তার প্রতিক্রিয়া কী হবে তারও অনুমান করতে পারেননি বলেই বোধহয় তারা এই সমস্যাটি কে এড়িয়ে গেছেন।এবং যখন উনবিংশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে ভারতীয় জনগণের তরফ থেকে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারে অগ্রগতি লক্ষ্য করা যায় তখনই তারা স্ত্রী শিক্ষার প্রতি অনুরাগী হন, তার আগে নয়।

এর পেছনে আরেকটি কারণ দায়ী ছিল বলে মনে হয়। একটি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতবর্ষে ইংরেজি শিক্ষার প্রবর্তন করেছিলেন। প্রশাসনের সমস্ত পদে ইংরেজদের দিয়ে পূর্ণ করলে যে আর্থিক ভার বহন করতে হবে তার জন্য কোম্পানি সরকার একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। ফলে প্রশাসনের তলার দিকে কম দায়িত্বশীল পদে শিক্ষিত ভারতীয়দের নিয়োগ করার জন্য তারা পাশ্চাত্য শিক্ষায় উৎসাহী হয়ে ওঠে।কম বেতনের কর্মচারীদের প্রয়োজনীয়তা এরা পূরণ করবে বলে মনে করা হয় ।কিন্তু একই শিক্ষা মেয়েদের দিলে মেয়েরাও যে অনুরূপ কাজ করতে সক্ষম হবে সেই ভাবনা কিন্তু উনবিংশ শতকের ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় কখনোই সম্ভব ছিল না বলে ইংরেজি সরকারের মনে করতেন। সুতরাং একটি সাধারণ শিক্ষাই ছিল মেয়েদের জন্য যথেষ্ট।তাই সমাজের একটি অংশকে উচ্চশিক্ষা দিয়ে অপর একটি অংশকে অশিক্ষার অন্ধকারে নিমজ্জিত রাখতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কোন কুণ্ঠা বোধ করেনি।

অর্থনৈতিক দিক থেকে একটি তৃতীয় দৃষ্টিকোণ খুঁজে পাওয়া সম্ভব।ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কোন জনকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান ছিল না। অর্থনৈতিক বিস্তারের জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীতে কোম্পানিকে রাজনৈতিক সংঘর্ষ অবতীর্ণ হতে হয়েছিল এবং অনেক পথ অতিক্রম করে কোম্পানি অবশেষে নিজেকে একটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। **১৮১৩ সালে** সরকারি আইন বলে **কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যের আধিপত্যের অবসান** ঘটে এবং ভারতের ক্ষেত্রে **অবাধ বাণিজ্য নীতি** গৃহীত হয়।এবং এই নীতির প্রেক্ষাপটে যখন কোম্পানির সনদ নবীকরণ করা হয় তখন প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে কোম্পানির প্রচেষ্টা ছিল ভারতীয় পণ্যের পরিবর্তে কিভাবে ব্রিটিশ পণ্য প্রচলন করা সম্ভব? কিভাবে ব্রিটিশ পণ্যকে ভারতীয় পণ্যের বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করানো যাবে? এই পরিকল্পনায় প্রথম অসুবিধা ছিল ভারতীয়দের দারিদ্র।ওয়ারেন হেস্টিংস জেনারেল কমীটির মিটিং এ স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দিয়েছিলেন ভারতীয়দের ব্রিটিশ পণ্য কেনার মতো আর্থিক সঙ্গতি নেই। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য পাওয়া যায় স্যার টমাস মনরো বিবরণ থেকে।তিনি সুস্পষ্টভাবে বললেন ভারতীয়রা তাদের তৈরি মোটা পশম বস্ত্র ব্যবহার করতে পছন্দ করে সুতরাং ইংল্যান্ডের পশম বস্ত্র ভারতীয়দের মধ্যে প্রচলন করা সম্ভব নয়।কিন্তু তা সত্বেও ভারতবর্ষে ব্রিটিশ পণ্যের অবাধ প্রবেশ এর ফলে প্রাচীন ভারতীয় হস্ত শিল্পের বিনাশ ঘটে এবং ভারতের আর্থিক দুরবস্থা আরো ব্যাপক আকার ধারণ করে ভারত সর্বতোভাবে বৃটেনের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে।

সরকারের সংস্কারমূলক কর্মসূচির মধ্যে শিক্ষা সংস্কার গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। জন স্টুয়ার্ট মিল তার শিক্ষার ধারায় জ্ঞানদীপ্ত নাগরিক তৈরি করার প্রস্তাব দিয়েছিলেন।তাকে আরো বাস্তবায়িত পার্থিব ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে শিক্ষার প্রসারের কথা ভেবেছিলেন ইংরেজ সরকার।ইউরোপীয় শিক্ষাব্যবস্থা প্রসারিত হলে ভারতে ইউরোপীয় বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে ভারতীয়দের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটবে এবং তখন তারা ব্রিটিশ পণ্যের জন্য চাহিদা বোধ করবে।ব্রিটিশ সভ্যতার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তারা ইংরেজ জীবনযাত্রাকে অনুসরণ করবে এবং সেই পথে প্রবেশ করবে ভারতে ব্রিটিশ পণ্য।এভাবেই ভারতে বিশাল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটবে বলে ব্রিটিশ শাসকরা আশা করেছিল এবং শিক্ষার প্রসার ঘটলে সুনিশ্চিতভাবে ভারতে ব্রিটিশ বাণিজ্যের প্রসার ঘটবে ব্রিটিশ শাসক সেটাও আশা করেছিল।

শিক্ষাকে এক সীমিত অর্থ চিন্তা করার ফলে অন্তঃপুরবাসিনী লোকের মধ্যে শিক্ষার প্রসারে কথা ব্রিটিশ সরকার ভাবেনি।ভারতীয় নারীকে ব্রিটিশ পণ্যের উপভোক্তা করবার জন্য উপযুক্ত ভাবে

তৈরি করতে হলে প্রথমেই তাকে নিজের সমাজের প্রতিবন্ধকতা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সক্রিয় ভাবে সহযোগিতা করা প্রয়োজন ছিল। ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদ সমাজের গভীরে প্রবেশ করলে সমাজ ব্যবস্থার অচলায়তন ভাঙা যেত। তখনই বোধহয় নারী সম্প্রদায় শিক্ষা ও মুক্তির আশা করতে পারত। কিন্তু সেইরকম কোনো ভাবনা সরকারের ছিল না।

আদর্শবাদী গোষ্ঠীর বিপরীতে অবস্থান করছিল অপর একদল বাস্তববাদী গোষ্ঠী যারা পুরুষ ও স্ত্রী উভয়ের শিক্ষা দেবার বিরোধী। এলেনবরা ছিলেন তাদের প্রতিনিধি। শিক্ষা দ্বারা কোনরকম সামাজিক পরিবর্তনের তিনি বিরোধিতা করেছেন। ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষাদান তার মতে বিপদজনক।কারন, কোন চিন্তাশীল জনগণ আমাদের শাসন ব্যবস্থা মেনে নেবে না।শাসন ব্যবস্থার সর্বোচ্চ স্তর এ সবসময় ব্রিটিশ প্রাধান্য অক্ষুন্ন রাখতে হবে।এই ধরনের মানসিকতা সম্পন্ন প্রশাসকেরা স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারে যে কোনোমতেই উৎসাহ দেবেন না ,এ বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

পরিশেষে উল্লেখ করা যায় সমসাময়িক ইংল্যান্ডে অষ্টাদশ শতকে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে স্ত্রীশিক্ষা ছিল অপ্রতুল।সমাজের দরিদ্র শ্রেণীর স্ত্রী সম্প্রদায় প্রায়শই সাধারণ শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছিল। এমনকি ধনী গৃহেও ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের কম শিক্ষা দেওয়া হতো।ইংল্যান্ড সরকার মহিলা শিক্ষার অগ্রগতির জন্য বিশেষ কিছু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি সেই যুগে।সেখানে তার উপনিবেশে মেয়েদের শিক্ষার জন্য ব্রিটিশ সরকার কিভাবে উপযুক্ত নীতি গ্রহণ করবে? ফলে ইউরোপীয় ভিক্টোরীয় নীতি অনুসরণ করে ভারতবর্ষে মেয়েদের শিক্ষার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছিল ব্রিটিশ সরকার দ্বারা সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।